ATHENA, VOLUME IX, JULY 2025 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 181–189
*www.athenajournalcbm.in*

# মুঘল ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ: একটি অনুসন্ধানমুলক আলোচনা

**আলাউদ্দিন সেখ***

প্রাপ্ত: ১২.০২.২০২৫ পরিমার্জন: ২১.০৩.২০২৫ গৃহীত: ০৩.০৫.২০২৫

***সারসংক্ষেপ:*** *পৃথিবীর বুকে বাস্তুতন্ত্রকে সঠিকভাবে সচল রাখার জন্য সকল জীবজন্তুদের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় থাকা অতি আবশ্যক। কেননা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীবজগতের খাদ্য খাদকের গড় সংখ্যার উপর নির্ভর করে এই বাস্তুতন্ত্র। এই গড় সংখ্যায় কোনো রকম কমবেশি হলেই সরাসরি বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব আসবে। এতে করে মানুষ-সহ সমস্ত জীবজগতে প্রভাব পরবে। কিছু মানুষের ব্যবসায়িক মুনাফা এবং অতিরিক্ত লোভের জন্য সুন্দর এই পৃথিবীতে অনেক পশুপাখি প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। এই সকল অশুভ শক্তির হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে বন্য পশুপাখি সংরক্ষণ অবশ্য কাজ হয়ে উঠেছে। যদিও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ একটি আধুনিক ধারণা যা বিভিন্ন কারণে যেমন শিকার, প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতিসাধন, জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদির ফলস্বরূপ বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাসকে কেন্দ্র করে উৎপত্তি হয়েছে। এই নিবন্ধের মুল উদ্দেশ্য প্রাক্-আধুনিক সময়ে বিশেষ করে মুঘল ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ধারণা অনুসন্ধান করা। মনে রাখা দরকার যে সেই সময় মুঘল বাদশাহরা সক্রিয়ভাবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেষ্ট হয়েছিলেন এমনটাও নয়। সংরক্ষণের পুরো ধারণাটির সূত্রপাত ঘটে মুঘল সম্রাটদের শিকার প্রথাকে কেন্দ্র করে। প্রায় সব মুঘল সম্রাটই ছিল শিকার প্রেমী। তারা শিকারকে সফলতা প্রদান করতে বন্য পশু ও তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এছাড়াও, নিজেদের একচেটিয়া শিকারের চাহিদা পূরণ করতে মুঘল সম্রাটরা বিশেষ কিছু বন্যপ্রাণী শিকারের উপরে বাধা নিষেধ জারি করে। বিশেষ প্রজাতি যেমন শিকারি চিতা মুঘল বাদশাহদের শিকার অভিযানে হরিণ শিকারে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করত, ফলস্বরূপ চিতা সংরক্ষণেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অতএব এই নিবন্ধের মুল লক্ষ্য বন্যপশু সংরক্ষণ করার পিছনে মুঘল শাসকদের নানাবিধ উদ্দেশ্যের অন্বেষণ করা। এছাড়া, সংরক্ষণে মুঘলরা কি কি পন্থা অবলম্বন করেছিল তার চরিত্র বিশ্লেষণ করা।*

***সূচক শব্দ:*** *শিকার, বন্যপ্রাণী, সংরক্ষণ, মুঘল সম্রাট, আকবর, জাহাঙ্গীর, হরিণ, চিতা।*

*পিএইচ.ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর প্রদেশ।
e-mail: alauddinwb98@gmail.com

পৃথিবীর বুকে বাস্তুতন্ত্রকে সঠিকভাবে সচল রাখার জন্য সকল জীবজন্তুদের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় থাকা অতি আবশ্যক। কেননা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীবজগতের খাদ্য-খাদকের গড় সংখ্যার উপর নির্ভর করে এই বাস্তুতন্ত্র। এই গড় সংখ্যায় কোনো রকম কমবেশি হলেই সরাসরি বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব আসবে। এতে করে মানুষ-সহ সমস্ত জীব-জগতে প্রভাব পরবে। কিছু মানুষের ব্যবসায়িক মুনাফা এবং অতিরিক্ত লোভের জন্য সুন্দর এই পৃথিবীতে অনেক পশুপাখি প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। এই সকল অশুভ শক্তির হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে বন্য পশুপাখি সংরক্ষণ অবশ্য করণীয় হয়ে উঠেছে।

সংরক্ষণ বিষয়টি যদিও আধুনিক ধারণাগত কিন্তু মুঘল ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ধারণাটি সম্রাটদের শিকার প্রথাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আপাতদৃষ্টিতে শিকার এবং তাদের সংরক্ষণ বিষয়টি একে অপরের থেকে বিপরীত বলে মনে হয়। শিকার শব্দটি ইঙ্গিত দেয় পশু পাখির বিনাশ সাধন আর অন্য দিকে সংরক্ষণ বলতে বোঝাই সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেই প্রজাতিকে সুরক্ষা প্রদান করা বা প্রজননের দ্বারা তাদের বৃদ্ধি ঘটানো যাতে করে পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্র বজায় থাকে। তবুও বলা যায়, প্রাক্-আধুনিক যুগে রাজা-মহারাজাদের কাছে শিকার যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় ছিল প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের সংরক্ষণ। অন্যভাবে এটাও বলা যেতে পারে যে, মুঘল যুগে শিকার এবং সংরক্ষণ ছিল একে অপরের পরিপূরক। সম্রাটদের সফলভাবে শিকার করা আংশিকভাবে নির্ভর করত বন্যপ্রাণী ও তার উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের সঠিক পরিচর্যার উপর। শিকার ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপশু ব্যবহার করা হতো টোপ হিসেবে অন্য প্রজাতির পশুদের প্রলোভন দেখাতে, যেমন বাঘ শিকারে ব্যবহার করা হতো ছাগল, হরিণ ইত্যাদি। তাদের পরিচর্যাও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে। এছাড়াও নান্দনিক সৌন্দর্যের জন্য নিয়মিত পশু-পাখির সরবরাহও তাদের যথাযথ প্রাকৃতিক বাসস্থানের দাবি রাখে। অতএব নিবন্ধের মুল আলোচ্য বিষয় হলো সম্রাটদের অত্যধিক পশু-শিকারের অভ্যাস থেকেই সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উদ্ভূত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করা। প্রাক্-আধুনিক প্রেক্ষাপটে শিকার ও সংরক্ষণ এক সময়ে একটি পরস্পর বিরোধী ধারণা বলে মনে হলেও অন্য দিকে একে অন্যের পরিপূরক ঘটনা বলেই মনে হয়। আমাদের এও মনে রাখা উচিত যে, এই সময় কালে সম্রাটের পক্ষ থেকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সর্বদা একটি সচেতন প্রচেষ্টা ছিলনা। প্রচুর পরিমানে শিকারের ফলে যখন প্রয়োজন দেখা দেয় ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে, তারা বন্যপ্রাণী ও তাদের প্রাকৃতিক বাসস্থান সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিল। তাই মনে রাখা দরকার যে, মুঘল আমলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ভিন্ন পরিস্থিতিতে উদ্ভব হয়ে ছিল।

**শিকারগাহে[২] (Shikargah) বন্যপ্রাণীর পরিচর্যা**

মুঘলদের শিকারগাহ এবং আস্তাবল ভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখিদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। মুঘল বাদশাহদের কাছে তাদের বাবহারের ক্ষেত্র ছিল বিষদ। যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়াই থেকে শুরু করে পরিবহনের উদ্দেশ্যে তাদের উপকারিতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। মুঘল আস্তাবলে সেই সব প্রাণীদের রাখা হতো যাদের পোষ মানানো সহজসাধ্য ছিল। যেমন ঘোড়া, উট, হাতি ইত্যাদি। এছাড়াও তাদের প্রজননের জন্য বিশেষ কোনো বাবস্থাপনার প্রয়োজনও হতোনা। অন্যদিকে মুঘল শিকারগাহতে বন্য পশুদের বসবাস ছিল। এখানে সেইসকল প্রাণীদেরই রাখা হতো যাদের প্রকৃত অর্থে পোষ মানানো খুব দুষ্কর এবং এরা প্রজননের জন্য একটি উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের দাবি রাখে। এই সকল প্রজাতির মধ্যে গণ্য করা হতো চিতা, বাঘ এবং সিংহকে। এই তিনটি বন্য পশুর মধ্যে মুঘল সম্রাটরা চিতাকে পোষ মানাতে সার্থক হয়েছিল। তাই এই অংশে আমাদের আলোচ্য বিষয় চিতার পরিচর্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এছাড়াও হরিণ ছিল চিতার অন্যতম শিকার এবং শিকারগাহতে তাদের পরিচর্যাও ছিল মুঘলদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বাদশাহ ছিলেন আকবর (Akbar)। তাঁর মধ্যে খুব অল্প বয়সেই শিকারের প্রতি একটি সুক্ষ ধারণা তৈরি হয়েছিল। ১৩ বছর বয়সেই তিনি তরবারি দ্বারা একটি নীলগাই *(nil gai)* হত্যা করেছিলেন[২] এবং ১৫

বছর বয়সে চিতা (Cheetah) শিকার করেছিলেন।[৩] পরবর্তীকালে চিতার প্রতি আকবরের প্রচণ্ড আগ্রহ জন্মেছিল এবং চিতাকে পোষ মানিয়ে হরিণ (Deer) শিকারে সঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। এই থেকে চিতা শিকারের সাথে সাথে তিনি চিতাকে উপযুক্ত পরিবেশে রক্ষনাবেক্ষনের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

**চিতা (Cheetah-Acinonyx jubatus)**

আকবরের প্রধান উপদেষ্টা ও ঐতিহাসিক আবুল ফজল (Abul Fazl) তাঁর *আইন-ই-আকবারি (Ain-i Akbari)*-তে তুলে ধরেছেন যে, আকবর প্রায় ১,০০০টি চিতা সংগ্রহ করেছিলেন। *ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গিরি (Iqbalnana-i Jahangiri)*-তে বলা হয়েছে আকবরের শিকারগাহতে প্রায় ৯০০০ চিতা সংগ্রহ করা হয়েছিল।[৪] জাহাঙ্গীরের আমলে চিতার সংখ্যা উল্লেখ করা হয় আনুমানিক ৪০০।[৫] তৎকালীন সময়ের ভ্রমণকারী ইউরোপীয়ো বণিকরাও আকবর ও জাহাঙ্গীরের দরবারে চিতা সংগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন র‍্যালফ ফিচ (Ralph Fitch), টমাস রো (Thomas Roe), উইলিয়াম হকিন্স (William Hawkins), এডওয়ার্ড টেরি (Edward Terry) প্রমুখ।[৬]

আবুল ফজলের দাবি অনুযায়ী হরিণ শিকারের জন্য আকবর তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে চিতাকে নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আকবর নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ করেছিলেন এবং তাদের সঠিক পরিচর্যার জন্য তিনি চিতাকে আটটি শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি ১০টি চিতা প্রতি একটি দল তৈরি করেছিলেন। তাদের মধ্যে বিশেষ কিছু চিতা আকবরের প্রিয় ছিল এবং তাদের 'খাসা' *(khasa)* শ্রেণিতে রাখা হয়েছিল। এমনকি আকবর তার প্রিয় চিতাদের নামও রেখেছিলেন যেমন মদনকালী, দৌলত খান এবং দিলরাং। আকবরের শিকারগাহতে একটি চিতা দৈনিক কত পরিমাণ খাদ্য আহার করত আবুল ফজল তারও তথ্য প্রদান করেছেন।[৭] (সারণি: ১)

সারণি: ১

| চিতার শ্রেণি বিভাগ | শ্রেণি অনুযায়ী মাংসের পরিমান |
|---|---|
| প্রথম শ্রেণি | ৫ সের (ser) |
| দ্বিতীয় শ্রেণি | ৪.৫ সের |
| তৃতীয় শ্রেণি | ৪ সের |
| চতুর্থ শ্রেণি | ৩.৭৫ সের |
| পঞ্চম শ্রেণি | ৩.৫ সের |
| ষষ্ঠ শ্রেণি | ৩.২৫ সের |
| সপ্তম শ্রেণি | ৩ সের |
| অষ্টম শ্রেণি | ২.৭৫ সের |

চিতা পরিচর্যার জন্য আকবর বিশেষ অফিসারদের নিয়োগ করেছিলেন।[৮] আকবর নিজেও নিয়মিত সেই সব প্রাণীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতেন। ফাদার মনসেরাতের (Father Monserrate) তথ্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে চিতা এবং হরিণ-সহ অন্যান্য প্রাণীদের আকবরের সামনে হাজির করতে হতো। যাদের পরিচর্যার জন্য আকবরের তরফ থেকে নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা থাকত।[৯] আকবরের দরবারে রাজকার্য চলা অবস্থায় চিতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় মুঘল আমলের চিত্রকলায়।[১০] দরবারে এবং শিকারগাহতে চিতার উপস্থিতি আমাদের সুচিত করে যে, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে মুঘল সম্রাটরা তাদের উপযোগী বাসস্থান ও যথাযথ পরিচর্যার ব্যবস্থা করেছিলেন। আকবর তাঁর রাজধানী

ফতেপুর সিক্রিতে চিতা কক্ষ (cheetah-khana বা leopard cell) নির্মাণ করেছিলেন (চিত্র নং ১ ও ২)। তাদের মূলত হরিণ শিকারে এবং রাজকার্যে প্রদর্শনীর জন্য রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানে রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে এই চিতাদের দেখাশোনার জন্য চিতা-খানার পাশে কর্মচারীদের একটি কক্ষ লক্ষ্য করা গিয়েছে।[১১]

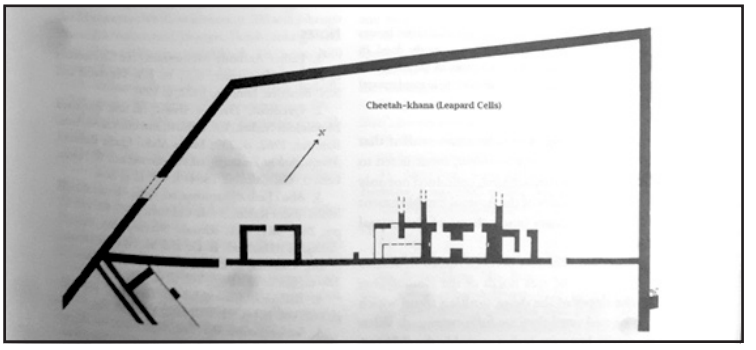


চিত্র নং ১: A map of cheetah-khana (leopard cells) at Fatehpur Sikri
তথ্যসূত্র: S. A. Nadeem Rezavi, (2013), *Fatehpur Sikri Revisited*

চিত্র নং ২: A View of Cheetah Khana with its central opening at Fatehpur Sikri
তথ্যসূত্র: R. C. Gaur, (2000), *Excavations at Fatehpur Sikri,* pl. CIV

**হরিণ (Deer-Cervidae)**

বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মুঘল শাসকরা শিকারগাহতে হরিণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণেও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। যেমন বিনোদনকে কেন্দ্র করে হরিণের মধ্যে লড়াই উৎসব, বাঘ ও চিতা শিকারে হরিণকে টোপ হিসেবে ব্যবহার এবং বন্য হরিণ শিকারের জন্য পালিত হরিণের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে মুঘল সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান তাদের সংরক্ষিত শিকারগাহতে হরিণের রক্ষণাবেক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া নান্দনিক সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী কিছু পশু-পাখির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিও করা হয়েছিল। শিকারগাহতে সেই

সব বন্যপ্রাণীদের পরিচর্যার জন্য বিশেষ অফিসারদের নিয়োগ করা হয়েছিল যেমন— মীর-শিকার *(mir-i-shikar)* ও কারাওয়াল *(qarawal)*[২২]

হরিণ সম্পর্কে আবুল ফজল আমাদের জানিয়েছেন যে, আকবরের আস্তাবলে ১২,০০০ হরিণ ছিল।[১৩] অন্যদিকে উইলিয়াম হকিংস (William Hawkins) জানিয়েছেন যে, জাহাঙ্গীরের দরবারে ৩,০০০ হরিণ ছিল যা হরিণ লড়াই (Deer Fight) বা বিনোদন (Amusement) এবং শিকারের *(Shikar)* উদ্দেশ্যে পালন করা হতো।[১৪] আকবর হরিণগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি শ্রেণির জন্য যথাযথ প্রবিধান তৈরি করা হয়েছিল। প্রথম সারির হরিণগুলিকে 'খাসা' *(khasa)* শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছিল। আকবরের দরবারে 'খাসা' হরিণের সংখ্যা ছিল ১০১টি। প্রতিটি হরিণের নির্দিষ্ট নাম ছিল যেমন—চিত্ররঞ্জন (Chitranjan)। দশটি হরিণ প্রতি একজন করে রক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। বাকি দুই শ্রেণির মধ্যে ছিল 'কোটাল' *(Kotal)* ও 'অর্ধ কোটাল' *(Haft Kotal)* হরিণ। হরিণ পার্কে (Deer Park) বা শিকারগাহতে *(Shikargah)* তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শিকারগাহতে তাদের পরিচর্যার দায়িত্বে মনসবদার *(mansabdar)* এবং আহাদী *(Ahadi)* (বাদশাহের নিজস্ব সেনাবাহিনী) ছাড়াও অন্যান্য সেনাদের মোতায়েন করা হয়েছিল।[১৫] হরিণগুলিকে তাদের শ্রেণি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের খাদ্য শস্য যেমন—ময়দা, মাখন এবং ঘাস খাওয়ানো হতো।[১৬]

অতএব আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণ ও পরিচর্যায় মুঘল শাসকদের বিভিন্ন উদ্যোগ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি তাদের গভীর উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটায়। ভারতের বাস্তুতন্ত্রের উপর তাঁদের স্থায়ী প্রভাব আজও অব্যাহত রয়েছে।

**বন্যপ্রাণী সংরক্ষণজনিত ব্যয়**

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ মুঘল শাসকদের জন্য একটি ব্যয়বহুল কাজ ছিল। বিশেষ করে মুঘল সম্রাট আকবর এই প্রচেষ্টায় যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছিলেন। শিরীন মুসভির অনুমান অনুসারে আকবর শিকারী পশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বার্ষিক ব্যয় করেছিলেন প্রায় ১,৩০,০০,০০০ দাম *(dam)*। এর মধ্যে খাদ্য, আশ্রয়স্থল, পশুচিকিৎসা বাবদ খরচ এবং সেইসাথে তাদের যত্ন নেওয়া পরিচারকদের মজুরিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর হিসাব অনুযায়ী এক বছরে শুধুমাত্র চিতার উপর সম্রাট আকবরের ব্যয় ছিল আনুমানিক ৭০,০০,০০০ দাম। চিতার পরিচর্যায় কিছু অতিরিক্ত খরচ ছিল যেমন— চিতাকে শিকারগাহতে পরিবহন বাবদ খরচ, চিতাকে শিকারে প্রশিক্ষণ বাবদ খরচ ইত্যাদি।[১৭]

**প্রজনন সংক্রান্ত উদ্যোগ**

প্রজনন (breeding) হলো যেকোনো প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার অন্যতম একটি মাধ্যম। বর্তমানে পরিবেশবিদগণ বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কৃত্রিম উপায়ে হ্রাসপ্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের প্রজননের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলেছেন। প্রজননের ঠিক অনুরূপ উদাহরণ মুঘল যুগেও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর প্রকৃত অর্থে প্রজননের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিশেষ ও দুর্লভ কিছু পশু-পাখিদের পরিবৃত্ত করতেন এবং তাদের বসবাসের উপযুক্ত আবাসস্থানও তৈরি করেছিলেন। এই বিষয়ে জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মকথা *তুযুক-ই-জাহাঙ্গিরি (Tuzuk-i Jahangiri)*-তে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর কথা মতে লাহোরের রোহতাস দুর্গের (Rohtas Fort) মধ্যে 'কামার-গাহ' *(Qamargah)*।[১৮] শিকারের দরুন তিনি ২০০টি লাল এবং সাদা হরিণ (red and white deer) বন্দী করেছিলেন।[১৯] এই প্রজাতির হরিণ গিরঝাক (Girjhak) এবং নন্দনাহ (Nandanah) ছাড়া পুরো 'হিন্দুস্তান'-এ কোথাও দেখা যায়না। তাই এই দুর্লভ প্রজাতির হরিণগুলিকে রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের বংশ বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক হরিণকে অন্য একটি জায়গায় স্থানান্তরিত করার কথাও বলেছিলেন।[২০] এই প্রজাতির হরিণের প্রজননের জন্য জাহাঙ্গীর

কোন জায়গার কথা মাথায় রেখেছিলেন তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। ফতেপুর সিক্রি-তে (Fatehpur Sikri) একটি সংরক্ষিত শিকার-গাহের উল্লেখ আমরা পায় জাহাঙ্গীরের বর্ণনাতে। তাঁর মতে, আগ্রার পার্শ্ববর্তী সমুগড় (Samugarh) নামক শিকার-গাহতে তিনি ৯১৭টি হরিণ শিকার করেছিলেন যার মধ্যে ৪০৪টি হরিণ ফতেহপুরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং সেখানে একটি সংরক্ষিত শিকারগাহতে তাদের যথাযথ পরিচর্যার বাবস্থা করেছিলেন।[২১] এখানে উল্লেখ্য বিষয় হলো বিরল প্রাণীদের নির্দিষ্ট পরিমান সংখ্যায় বজায় রাখতে জাহাঙ্গীরের এই উদ্যোগের সাথে বর্তমানে লুপ্তপ্রায় চিতাকে ফিরিয়ে আনতে ভারত সরকারের উদ্যোগের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বন্যপ্রাণীর প্রজনন সংক্রান্ত আরেকটি চমকপ্রদ ঘটনা জাহাঙ্গীরের স্মৃতি কথা থেকেই উঠে আসে। তিনি গর্বের সাথে আমাদের জানান যে, তার বাবা (আকবর) ১,০০০টি চিতা সংগ্রহ করেছিলেন এবং পুরুষ-চিতাকে স্ত্রী-চিতার সাথে মিলন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরও তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। তার কারণ হিসেবে জাহাঙ্গীর তুলে ধরেছেন যে চিতা বন্দী অবস্থায় প্রজনন করতে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু তাঁর নিজস্ব শাসনামলে একটি পুরুষ চিতার গলাবন্ধ ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে একটি মহিলা চিতার সান্নিধ্যে আসে এবং তাদের মধ্যে মিলন ঘটে। আড়াই মাস পরে মহিলা চিতাটি তিনটি শাবকের জন্ম দেয় এবং সেই শাবকগুলি সুস্থ অবস্থায় বড় হয়।[২২] এই ধরণের দৃষ্টান্ত জাহাঙ্গীরের সময়েই আমরা প্রথম পায়। তিনি আরও বলেন যে, চিতার মতো বাঘিনীও কখনো বন্দী দশায় অন্য বাঘের সংস্পর্শে আসেনা। এমনটা তাদের প্রকৃতির বিপরীত। কিন্তু তার শাসনামলে তিনি বন্দী বাঘিনীকে গর্ভবতী হতে এবং তিন মাসের ব্যবধানে তিনটি শাবকের জন্ম দিতে দেখেছিলেন।[২৩] জাহাঙ্গীর দাবি করেছেন তিনি এই ঘটনা দুটির প্রত্যক্ষদর্শী। এখানে তিনি প্রজনন সংক্রান্ত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন যেখানে তিনি বলেছিলেন চিতা প্রজননে আড়াই মাস সময় নেয়। যা আধুনিক সময়ের একটি পর্যবেক্ষণের দ্বারা সঠিক প্রমাণিত হয়। দিব্যাভানুসিং (Divyabhanusinh)-এর মতে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বন্দী দশায় চিতার প্রজননের ইতিহাসে এটিই হলো প্রথম দৃষ্টান্ত। ১৯৫৬ সালে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের ফিলাদেলফিয়া (Philadelphia) চিড়িয়াখানায় দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আসে।[২৪] এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, আকবর ও জাহাঙ্গীর প্রজননের উদ্দেশ্যে যে উদ্যোগগুলি নিয়েছিলেন যেমন— প্রাণীদের প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিচর্যা, নিয়ম করে খাদ্যের বণ্ঠন, বিরল প্রাণীদের বংশবৃদ্ধির উদ্দেশে উপযুক্ত পরিবেশ গঠন ইত্যাদি কাজের সাথে আমরা আধুনিক যুগের পেশাগত সংরক্ষণবাদীদের কাজের অনেক মিল খুঁজে পায়।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে মুঘল বাদশাহদের প্রচেষ্টা যদিও সবসময় নিয়মতান্ত্রিক ছিল না কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই পদ্ধতিগুলি সংরক্ষণের জন্য আরও কাঠামোগত পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের মুঘলদের উদ্যোগ আজও অনুসরিত হচ্ছে, যা আমাদের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।

**জীবরক্ষায় মুঘল সম্রাটদের আত্ম সচেতনতা এবং শিকার সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা**

মুঘল সম্রাটরা 'ফরমান' (farman) নামে রাজকীয় আদেশ জারি করতেন যেখানে জীবহত্যার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। এই বিধিনিষেধগুলি জীবের প্রতি সম্রাটদের গভীর শ্রদ্ধা এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে তাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। আকবর জীবকল্যাণের একজন উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা ছিলেন। তিনি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিনগুলিতে প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। বিভিন্ন প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছেন যা জীবরক্ষার প্রতি বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। আকবরের একটি উক্তি নিশ্চিত করে যে, "From my earliest years, whenever I ordered animal food to be cooked for me, I found it rather tasteless and cared little for it. I took this feeling to indicate a necessity for protecting animals, and I refrained from animal food."[২৫] জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মকথাই বলেছেন, আকবর বছরে তিন মাস মাংস আহার করতেন এবং বাকি নয় মাস সুফি খাদ্যাভ্যাস দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। সেই সময় যেকোনো জীবহত্যার ঘোর বিরোধী ছিলেন।[২৬] এছাড়াও তিনি মানুষকে

পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তারা নিজেদের পাকস্থলীকে 'পশুদের কবরস্থান' (graveyard of animal)-এ পরিণত না করে।[২৭] এছাড়া আকবর এবং জাহাঙ্গীর তাঁর সর্ব-ধর্ম সমন্বয় নীতিতে বিশ্বাসীদের জীবহত্যা থেকে বিরত থাকাকে একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে তুলে ধরেছেন। জাহাঙ্গীর ছন্দের দ্বারা বলেছেন:

"Be not the practiser of making lifeless any living thing.
Save in the battlefield or in the time of hunting."[২৮]

প্রাণী কল্যাণের প্রতি আকবরের আগ্রহ তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাসের বাইরেও প্রসারিত হয়েছিল। তিনি সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে বার্ষিক মাংস-মুক্ত দিবস (Meat-Free Day)-এর পক্ষে সম্মতি দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জীবহত্যা থেকে বিরত থাকায় তার রাজ্যে সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসবে।[২৯] জীবন রক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে তিনি অন্যান্য শাসকদের অত্যধিক শিকার থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, "although hunting suggests many analogies for kingly action, certainly the foremost of them is that the granting of life [to the doomed] becomes a habit."[৩০] আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে আকবরের এই ধরনের বিবৃতির উল্লেখ করেছেন যা পশু সুরক্ষার প্রতি তাঁর গুরুত্বকে তুলে ধরে।

জাহাঙ্গীর তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে শিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন। সিংহাসন আরহনের প্রথম বর্ষেই অর্থাৎ ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে জীবহত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। এই আদেশ অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার এবং রবিবার পশু-পাখি হত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।[৩১] এছাড়া জাহাঙ্গীরের প্রিয় হরিণ হংসরাজের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরপুরের সমতলভূমিতে হরিণের সমস্ত শিকার নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং রাজকীয় ফরমান দ্বারা ঘোষণা করেছিলেন যে "their flesh should be to Hindus and Muhammadans as is the flesh of cows and pig."[৩২]

ধর্মীয় ভাবাবেগও মুঘল সম্রাটদের শিকার থেকে বিরত থাকতে ও বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করতে প্রভাবিত করেছিল। যুবরাজ হিসেবে ষষ্ঠ মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব শিকারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তবে সিংহাসনারোহনের পর তিনি শিকার এবং তাঁর ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার মধ্যে দন্ধে জড়িয়ে পরেছিলেন। তিনি শিকার ত্যাগ করেন এবং তাঁর পুত্রকে এই কার্যকলাপে অত্যধিক লিপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করেন। তিনি অত্যধিক শিকারে লিপ্ত হওয়াকে ধর্মীয় ও রাজকীয় কর্তব্য থেকে বিচ্যুতি হিসাবে দেখতেন। ঔরঙ্গজেব ঘোষণা করেছিলেন "The hunting is the business of idle persons. It is very reprehensive for one to be absorbed in worldly affairs and to disregard religious matter."[৩৩]

শিকার থেকে সম্রাটদের সংযম যদিও সবসময় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বন্যপ্রাণী রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার ইঙ্গিত দেয়। এছাড়াও সংযম ও রাষ্ট্র আরোপিত নিষেধাজ্ঞা পশু পাখিদের হত্যার উপর নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা স্থাপন করেছিল। ব্যক্তিগত প্রত্যয় এবং ধর্মীয় বিবেচনা উভয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের কাজগুলি মুঘল ভারতে শিকার এবং বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আরও টেকসই পদ্ধতির নজির স্থাপন করে।

**উপসংহার**

মুঘল যুগে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ছিল শিকার সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুঘলরা তাঁদের শিকারের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করতেন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে মুঘলদের প্রচেষ্টা ইচ্ছাকৃত এবং স্বতঃস্ফূর্ত উভয়ই ছিল। তাঁদের সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে তাঁদের নিজস্ব বিশ্ব দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা উচিত। ধারণাগত ও পদ্ধতিগত দিক থেকে মুঘল সম্রাটদের সাথে আধুনিক কালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষকদের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উনবিংশ ও বিংশ শতকে বন্যপ্রাণী রক্ষার যেভাবে সূত্রপাত ঘটে তাঁর সূত্রধার হিসাবে মুঘল সম্রাট আকবরকে দেখা যেতে পারে। বন্যপ্রাণীর হত্যার

উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকে কেন্দ্র করে তাঁর বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে তাদের রক্ষার উপর যে তাগিদ তিনি দিয়েছেন সেটি তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। এছাড়া বন্যপ্রাণী, উদ্ভিদজগত ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর আগ্রহের জন্য আব্দুর রহমান এবং এম.এ. আলভী জাহাঙ্গীরকে 'Naturalist' বা 'প্রকৃতিবাদী' বলে আখ্যায়িত করেছেন (M.A. Alvi & A. Rahman, *Jahangir: the Naturalist,* Indian National Science Academy, New Delhi, 1965)। অতএব আমরা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে প্রকৃতি এবং জীব-জগতের রক্ষণাবেক্ষণে মুঘলদের উদ্যোগ সংরক্ষনের ইতিহাসে অনস্বীকার্য।

**সূত্রনির্দেশ:**

১. শিকারগাহ (*Shikargah*) বা hunting ground বলতে বিশেষ কয়েকটি স্থানকে বোঝানো হয়েছে যেখানে মুঘল সম্রাটরা স্থায়ীভাবে শিকার করতেন। এই শিকারগাহগুলিতে সম্রাটরা একচেটিয়াভাবে শিকার করতেন। সেখানে সাধারণ মানুষদের শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই রকম শিকারগাহ মুঘল রাজদরবারের নিকটস্থ স্থান দেখেই নির্বাচন করা হতো। যেমন—ফতেপুর সিক্রি ও আগ্রা। এছাড়াও আকবরের সময়ে স্থায়ী শিকারগাহ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এমন কয়েকটি জায়গার নাম সরবরাহ করেছেন তাঁর রাজনিতিক উপদেষ্টা ও ঐতিহাসিক আবুল ফজল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল বারি, রুপবাস, হিসার, সুনাম, ভাতিনডা, ভাটনির, আজমির, নাগাউর, পাটান, ফাতপুর, ঝুনঝুনু, মারতা, যোধপুর, জাইসালমির ইত্যাদি। বিষদ জানতে দেখুন Abu'l Faẓl, (1927). *Ā'īn-i Akbarī,* 3 vols., trans., H. Blochmann, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1873, revised & edited by D.C. Phillott and Jadunath Sarkar, vol. 1, p. 297. (henceforth *Ā'īn-i Akbarī*).

২. Abu'l Faẓl, (1973). *Akbarnama*, 3 vols., trans., H. Beveridge, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, 1902-1939, rept., New Delhi: Ess Ess Publications, vol. 1, p. 634.

৩. *Ibid*., vol. 2, pp. 186-87.

৪. *Ā'īn-i Akbarī,* 1, *op.cit.*, p. 298.

৫. Foster, William, (1921). (ed.). *The Early Travels in India, 1583-1619,* London: Oxford University Press, p. 104.

৬. *Ibid.,* pp. 17, 104, 184, 312.

৭. *Ā'īn-i Akbarī,* 1, *op.cit.*, pp. 297-300.

৮. শিকার অভিযানের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি দেখা-শোনার ভার দেওয়া হতো 'কারাওয়াল বেকি'-কে, যারা আবার 'মীর শিকার'-এর অধীনে কাজ করতেন। আকবরের পরবর্তী সময়ে কারাওয়াল বেকিই শিকারের সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এই অফিসারদেরই বন্যপ্রাণীর যাবতীয় বিষয় দেখা শোনার ভার দেওয়া হয়েছিল। দেখুন *Ā'īn-i Akbarī,* vol. 1, *op.cit.*, pp. 292-293; এছাড়াও এই বিষয়ে অতি সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন Ansari, Mohammad Azhar, (1960). 'The Hunt of the Great Mughals', *Islamic Culture,* Vol. 34, No. 1, p. 242.

৯. Monserrate, Father Anthony, (1922). *The Commentary of Father Monserrate,* Eng. translation by John S. Hoyland, annotated by S. N. Banerjee, Cuttack: Oxford University Press, p. 90.

১০. Divyabhanusinh, (2002). *The End of a Trail, the Cheetah in India,* 2nd ed., New Delhi: Oxford University Press, pp. 56-57.

১১. Gaur, R. C., (2000). *Excavations at Fatehpur Sikri (A National Project),* New Delhi: Aryan Books, pp. 57-59, plate no. XCVI, XCVII, XCVIII, CIV; এছাড়াও এই বিষয়টি খুব সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন Rezavi, Syed Ali Nadeem, (2013). *Fatehpur Sikri Revisited,* New Delhi: Oxford University Press, pp. 82-86.

১২. *Ā'īn-i Akbarī,* 1, *op.cit.*, pp. 292-293; Ansari, (1960). *op.cit.*, p. 242.

১৩. *Ā'īn-i Akbarī,* 1, *op.cit.*, p. 231; আপাত দৃষ্টিতে আবুল ফজলের দেওয়া উপরের সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত মনে হয়। কারণ Ralph Fitch-এর তথ্য অনুযায়ী আকবরের কাছে আগ্রা এবং ফতেপুরে মোট ১,৪০০ পালিত হরিণ ছিল। Foster, *The Early Travels*, *op.cit.*, p. 17.

১৪. *Ibid.*, pp. 104, 184.

১৫. *Ā'īn-i Akbarī,* 1, *op.cit.*, pp. 228-232; এছাড়াও হরিণের দেখাশোনার জন্য আকবরের রাজদরবারে আনুমানিক খরচ দেখিয়েছেন Moosvi, Shireen, (1987). *The Economy of the Mughal Empire, c. 1595, A Statistical Study*, New Delhi: Oxford University Press, p. 258.

১৬. *Ā'īn-i Akbarī,* 1, *op.cit.,* p. 231.

১৭. Moosvi, Shireen, (1987). *op.cit.,* pp. 256-257.

১৮. কামারগাহ ছিল শিকারের একটি পদ্ধতি যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীদের একটি নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে আবদ্ধ করা হতো যার পরিধি কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকত। মুঘল সম্রাটরা এইভাবে বন্যপ্রাণীদের শিকার করতেন।

১৯. Jahāngīr, (2006). *Tuzuk-i Jahangīrī*, Eng. trans., Alexander Rogers, edited by H. Beveridge, 1909-1914, rept. New Delhi: Low Price Publications, p. 129.

২০. *Ibid.*, pp. 81-82, 129.

২১. *Ibid.*, p. 203.

২২. *Ibid.*, p. 240.

২৩. *Ibid.*, pp. 240-241.

২৪. Divyabhanusinh, (1987). "Record of Two Unique Observations of the Indian Cheetah in Tuzuk-i-Jahāngīr", *The Journal of Bombay Natural History Society,* Vol. 84, No. 2, pp. 269-274.

২৫. Abu'l Faẓl, (1978). *Ā'īn-i Akbarī,* vol. 3, Eng. tr., Colonel H. S. Jarrett, revised by Sir Jadunath Sarkar, 1948, rept. New Delhi: Munshiram Manoharlal, p. 446.

২৬. Jahāngīr, *Tuzuk, op.cit.,* p. 45.

২৭. *Ā'īn-i Akbarī,* 3, *op.cit.*, p. 443.

২৮. Jahāngīr, (2006). *op.cit.,* p. 61.

২৯. *Ā'īn-i Akbarī,* 3, *op.cit.,* p. 446.

৩০. *Ibid.,* p. 451; See also Muḥammad Bāqir Najm-i Sānī, (1989). *Mau'iẓah*-i Jahāngīrī, Persian Text with translated with Introduction and Notes by Sajida Sultana Alvi, as *Advice on the Art of Governance,* Albany: State University of New York Press, p. 69.

৩১. Jahāngīr, (2006). *op.cit.*, p. 9.

৩২. *Ibid.*, pp. 90-91.

৩৩. *Ruka'at-i-Alamgiri or Letters of Aurangzeb,* (1908). tr., Jamshid H. Bilimoria, Letter to Sultan Muhammad Muazzam, No. XII, pp. 14-15.